সাহিত্যের ভাষা

অমিতাভ চৌধুরী

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

আমি মিথ্যে বলি, আমি বলি'। যা বলি, আর যা বলি না। কোনটা সত্য, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমি এখন ব্যস্ত থাকি এপিমেনেডিসের এই দার্শনিক প্রবচনে।

'মিথ্যে বলা' আর 'কথা বলা', ক্রিয়া ও কর্মের সমন্বয়ে দুটি ভিন্ন বাক্য বলে মনে হয় না। কেমন যেন অসম্পূর্ণ দুটি বাক্য। আর তাদের সমন্বয়ে এক অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত, অথবা রহস্য। দু-রকমের প্রস্তাবনা সম্ভব। দ্বিতীয় বাক্যটি ক্রিয়াপদ এবং প্রথম বাক্যটি কর্ম—এই প্রথম প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি একটু অন্যরকম, ক্রিয়া ও কর্মের পারস্পরিক নির্ভরতা, যে বাক্যটিকে যেরকম চিহ্নিত করা হবে। অর্থাৎ এমনও হতে পারে, 'মিথ্যে বলা'—ক্রিয়াটির কার্যকারণে 'কথা বলা'। এপিমেনেডিস অবশ্য প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন মাত্র, সমাধানের কোনো সূত্রের সন্ধান তিনি দেননি।

চিহ্নিত করার ব্যাপারটিই সাহিত্য রচনার মূল। (মিথ্যে বলার ব্যাপারটি সাহিত্য রচনায় বাক্য ও শব্দের ব্যবহার 'বস্তু' ও 'বিষয়' এবং তাদের অবস্থানের অনুবাদ প্রক্রিয়ার পরিপ্রক্ষিতে)। 'কথা বলা'-য় 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' উভয় পদই সম্ভব। 'আমি বলছি' কর্মপদটির উদ্দেশ্যও হয়ে ওঠে 'আমার বলা'। আবার সাহিত্যের ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় 'আমি বলছি'র সার্বভৌম অবস্থান সম্ভব নয়। আর, যা বলছি, কিংবা যে সম্পর্কে বলছি, অবশ্যই 'আমি বলছি', এই কর্মটির পূর্ব-অবস্থানগত কোনো ক্রিয়া অথবা কর্ম হয়ে উঠতে পারে না, কেননা যে মুহূর্তে 'আমি' চুপ করছি সেই মুহূর্তেই তাদের বিনাশ ও অবলুপ্তি।

'আমি বলছি'র অবস্থানটি একটি শূন্যতায়। সেই শূন্যতার সংখ্যাহীন খোলা দরজার ভিতরে ঢুকে আসে ভাষা আর ছড়িয়ে পড়ে সেই শূন্যতায়। তখন কথা বলছি যে 'আমি' সেই কর্তাব্যক্তিটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নগ্ন স্পেসে। এই সেই অন্তহীন শূন্যতা অথবা যেন পাস্কালের গহ্বর । কোনো উপস্থাপনা নয়, অর্থবহ বাক্য বিনিময়ও নয়, তার আদিম রূপে ভাষা ছড়িয়ে পড়ে শূন্যতায়। সাহিত্য সৃষ্টি সেই শূন্যতার ভেতর থেকে আহরণ করে তাকে একটি শুদ্ধ বহিরাবরণে প্রকাশের ক্রিয়া। এই প্রচেষ্টায় কর্তাব্যক্তিটি নিমিত্ত মাত্র, তাই তার উপস্থিতি শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য।

বহিরাবরণ রূপ পায় যখন, অন্তর আত্মটিও তৈরি হয়ে ওঠে এবং তার নিজের জন্যও প্রয়োজন হয় একটি আবরণের। ভাষা তখন নিজের দিকেই ধাবমান, আর প্রবক্তা নিমজ্জিত হয়ে যান শূন্যতায়। সেখানে বিচরণে তিনি তৈরি করে নিচ্ছেন তার অবস্থানগত ঝিকে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না সেই ঝিকে।

সাহিত্যসৃষ্টির কৃতকর্মটি তাই ভাষার ব্যবহারের এক অন্তহীন খোঁজ। এই খোঁজেই সাহিত্য ক্রমশ উপনীত হয় এক উগ্র অবস্থানে। তখন যতখানি সম্ভব নিরন্তন আদিম ভাষা থেকে সরে যাওয়া। আমাদের যা কিছু সৃষ্টি, যা কিছু সাহিত্য, সে সবই যেন ক্রমশই ভাষার আদিম নগ্নতাকে ভুলে যাওয়া, 'আমি বলছি'—কে আঁকড়ে থাকা, আর 'অন্তর-আত্মা'-র এক কৃত্রিমতার বাতাবরণ।

এই কৃত্রিম অবস্থানটিকে আধুনিক সাহিত্য আখ্যা দিয়েছে নিউট্রাল স্পেসে বলে, যেখানে প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ভাষাকে তার অন্তহীন অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়াহীন বন্ধনে বেঁধে রাখা। আরো মজা, সত্য অবিকৃত ও নগ্ন প্রকাশের ভাষা যে স্পেস তৈরি করে, সেই মৌলিক অবস্থান থেকে অনেকখানি ণত্ববোধক অবস্থানে বিচরণ করে সাহিত্যের ভাষা—'যে কথা বলা'।

সেই 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'—সমস্ত শ্রোতাই অমৃতের সন্তান। যদি এই আর্য বাক্য সত্য হয়। তাহলে ভাষা ও সাহিত্যের সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। অমৃতের পুত্র—সত্যের প্রতি তার সম্পূর্ণ অধিকার। সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করে আপন প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হতে চায় কে? কোন সে আমি, তার দ্বিধাগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ উচ্চারণে অনুপ্রাণিত করবে অমৃতের পুত্রগণকে? যার বিচরণ সীমাবদ্ধ সে কি কখনোই বিরত করতে পারে সীমাহীন বিচরণ স্পৃহাকে।

'আমি বলছি'র যে দায়বদ্ধতা তারই কারণে প্রত্যয়ও সীমাবদ্ধতা, সেই সীমাবদ্ধ প্রত্যয়েই সাহিত্যে চলমান অর্থপূর্ণতার অন্তর-ঝিকে বহির্বিশ্বে সমর্পণের চেষ্টা। তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বহির্ঝি পরিবর্তন করে নেয়, অথবা হয়তো সম্পৃক্ত করে নেয় 'বলা কথা'র অর্থ। আর চেয়ে দেখে যা দেখতে চায় সে। অবশেষে যা তৈরি হয় সেটি বহির্বিশ্বের নিজস্ব চেতনা ও বোধ, যা 'আমি'র পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে ভিন্ন। 'বলা কথা' শুনতে শুনতে শ্রোতার মনের ভিতরে তৈরি হয়ে ওঠে অসংখ্য স্পেস। যাদের যোগসূত্রটি কিন্তু সেই সূত্রহীন শূন্যতা, আর বক্তার ধ্বনি স্তব্ধ হলে সেই অসংখ্য অবস্থান তৈরি করে নেয় ভিন্নতর প্রতীতি। তার রূপ ও নিজস্ব চেতনার যে বিষয়, 'বলা কথা'-র সেই নিজস্বতা অন্তর্হৃত হয়ে তৈরি হয়ে ওঠে বহির্চেতনা।

আমরা কীভাবে দেখবো এই বহির্চেতনাকে? কান্ট ও হেগেল যে 'চিন্তার অনুশাসন'-এর কথা বলেছেন, কিংবা তার কোনো পরিপন্থী বোধ, অথবা, মার্কুইস ডি শাদের দ্বিধাহীন আসক্তি, যা নিয়ন্ত্রণহীন বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের উপায় বলে মনে করতেন তিনি, কিংবা হলডারম্যানের কবিতায় যেমন ঈশ্বরের অকৃতকার্যতার কারণে তার

উপস্থিতিও অস্বীকার, অপেক্ষায় দায়বদ্ধতায় বিচারকে উপেক্ষা? অথবা হয়তো ভাষার বিভাজনের কারণে ঈশ্বরগণ অন্তর্হিত হয়েছেন, কিম্বা সেই আদিম গ্রিক দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেননা তাঁরা খ্রিস্টিয় ধর্মের শয়তানের মতোই দুর্বলচিত্ত ও হঠকারি, কিংবা জীবনানন্দ যেমন জেনেছিলেন পৃথিবীর অন্ধকার রাতে নক্ষত্রের কাল গুনে এক হয়ে নক্ষত্রের সাথে জেগে থাকা, আমাদের জাগতিক চিন্তাকে একটি অবস্থান স্থাপন করার প্রচেষ্টা, মৃত্যু ভাবনায় জীবনের সন্ধান?

সমস্ত চিন্তার মধ্যেই মূল যে প্রশ্ন—এই যে বহির্চেতনার অভিজ্ঞতা, সেটি আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে কতখানি প্রভাবিত করে?

নিৎসে তো অনেকদিন আগেই পশ্চিমের ভাবনার সেই মেটাফিজিক্স আবিষ্কার করেছেন যা শুধুমাত্র ব্যাকরণের সঙ্গেই বাঁধা নেই, সেটি বাঁধা আছে অন্যতর প্রত্যয়ে জ্ঞান বিতরণ করবেন বলে আহ্বান করেছেন যিনি, তিনিই কথা বলেবেন শুধু। মালার্মে তো ঘোষণাই করেছেন, যা বোধগম্য তার থেকে দূরে সরে থাকার জন্যই ভাষার ব্যবহার।

মালার্মে, বেকেট, জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত তারা দায়বদ্ধ থেকেছেন সেই প্রতীতির প্রতি। যেখানে অপমৃত্যু হয়েছে বক্তার। তার শরীরের ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা থেকে অর্থবহতাকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যেই ভাষার বহিরাবরণের দ্যুতির উজ্জ্বলতা। শব্দের অন্তর্করণের বিচারের প্রচেষ্টা পরিত্যাগে জন্ম হয় এক ব্যবহারিক শক্তি যা দিয়ে ভাষার শরীরের ত্বকের দুর্ভোগ মোচনে বিষয়ের অবতারণা ও বিবর্তন। মালার্মে যেমন শিখিয়েছেন শব্দের যে ব্যবহারিক অর্থ তাকে বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন প্রতিপন্ন করার জন্যই শব্দের ব্যবহার। আরো আগে দুষ্মন্তের বিস্মৃতিতেই গড়ে উঠেছে অর্থহীন প্রতিশ্রুতির অর্থপূর্ণতা। পরিচয়হীনতাই ভাষার মুক্তি।

শব্দ সার্বভৌম আরোপিত অর্থ, যা কিছু তৈরি হয়ে ওঠে সত্য সন্ধানের মতো, সে সবই সেই অন্তহীন শূন্য বিচরণের প্রতিকূল পরিস্থিতির উপস্থাপনা। আমরা কথা বলি, অথচ অর্থবহতার জন্য শব্দের বন্ধনমুক্তির চেষ্টা করি না। আপাতগ্রাহ্য বক্তব্য নয়, শূন্য প্রদক্ষিণে শব্দগুলি তৈরি হয়ে উঠুক স্বচ্ছ ও দ্বারমুক্ত অনন্ত বোধের বিস্তৃতিতে, তখনই ভাষা হয়ে উঠবে দুর্দমনীয় অদৃশ্য এক সংঘাতের মতো—শব্দ যোজনায় শব্দ ভাঙার প্রক্রিয়া আর তাদের শরীরে গতি সঞ্চার। একমাত্র এই গতিতেই গড়ে ওঠে অর্থবহতা যা সত্য অনুসন্ধানে কার্যকর।

আসলে, শেষ পর্যন্ত, ভাষা অবয়বহীন, উচ্চারণেই তার প্রকাশ ঝর্ণার বয়ে চলার মতো। বয়ে চলা, হারিয়ে যাওয়া ও আবার আত্মপ্রকাশে যেমন ঝর্ণার প্রকৃত পরিচয়, ভাষার পরিচয়টিও একটি dissimulation—সময়ের বিবর্তনে ক্ষয়ে যাওয়া। অথবা সময়ই যেমন ক্ষয়ে যায় ভাষাও ক্ষয়ে যায়। ও শেষ পর্যন্ত শূন্য গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার অথবা সেছই খানেই তার অপেক্ষা।

ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে নির্দেশিত করা হয় তার ভেতরের বোধটির প্রতি, অথচ এই বোধটি চির স্থিত। তার নতুনতর কোনো অবস্থান সম্ভব নয়। কেবলমাত্র নিজের মধ্যেই নিজের স্থিতি আর অপেক্ষার মুহূর্ত, নতুন একটি রূপের জন্য। এই অপেক্ষাকে গৌরবান্বিত করার জন্যই সাহিত্য প্রয়াস। ভাষা বহন করছে যে বোধ সেটি যেমন স্থিতি, আবার ততখানিই গতিসম্পন্ন। কেননা সময়ের সঙ্গে তার অবস্থানটিও পাল্টে যাচ্ছে। একথাটিও সত্য, এই নিরন্তর চলার হাত থেকে কোনো নিষ্কৃতি নেই, বিশ্রামের সুখ অসম্ভব, আর চলমান বলেই অন্তর্ধি বেঁধে রাখতে পারে না তাকে।

হয়তো একারণেই গ্যেটে, টমাস মান ও অন্যান্য জার্মান সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করেছেন স্মৃতিকে একটি আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে নিয়ে যেতে, আর তাই সাহিত্যকে আধার করেছেন জ্ঞান অর্জনে। যা দেখেছি তারই ধীর ও বিস্মৃত স্মৃতি রোমন্থন, সমগ্র ধিকে একটি পরিচিত রূপে প্রকাশ, আর এই কর্মকাণ্ডে পৃথিবীকে মানুষের পরিমাপের মধ্যে নিয়ে আসা।

পরবর্তী সময়ে স্যুরিয়ালিস্টদের অবস্থানটি অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা ধিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের পরিমাপ থেকে অনেক দূরে। সাহিত্য সৃষ্টিই হল জ্ঞান আর জ্ঞান হয়ে উঠল সাহিত্য, ভাষা হয়ে উঠল বোধগম্যতার বহির্মণ্ডল, প্রতীতির নাগালের বাইরে। যা কিছুই মানুষের অন্তর থেকে দূরতর সেখানেই তারা পাঠিয়ে দিলেন পাঠককে। এ এক অদ্ভুত বিস্মৃতির প্রস্তাবনা। যা কিছুই বোধগম্য, যা কিছুই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, পরিত্যাগ করতে হবে সব, আর এই পরিত্যাগ যে শূন্যতা, পরিত্যাগ করতে হবে তাকেও, যেন এক আত্মহননের প্রক্রিয়া। অবোধ্যতার মধ্যে বোধের সীমা, অপরিচয়ের মধ্যে পরিচয়ের সন্ধান, এসব কিছুই শেষ পর্যন্ত হঠকারিতা।

তাই আমাদের প্রয়োজন অন্যতর অনুসন্ধান। যে প্রশ্নটি পীড়া দেয় সেটি অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া, যেন কক্ষ্যচ্যুত হয়ে একটি ব্যাহত ভাবনা কেবলই আরোপিত হচ্ছে প্রত্যক্ষ বিশ্বে, দৃশ্যমান সমস্ত প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থলে। আর সেই অচেনা, অপোরিচিত ও প্রায় মারমুখী আবহকে প্রত্যক্ষে ও মোকাবিলায় যেন ভাঙা আরসিতে প্রতিবিম্বিত হয় এক বিস্ময়কর অবমননে, অপ্রকৃতিস্থতায় আর স্বপ্নে। আর সেই মুহূর্তে, আরোপিত অর্থে নয়, অর্থহীনতা শব্দ ও ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, অসম্পূর্ণ অথচ অসত্য নয় এমন একটি প্রত্যয়ে।

আমরা কি তবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবো কোনো এক প্রত্যয়ের প্রতি ও নিয়োজিত হব সেই প্রত্যয়ের রূপ উদ্‌ঘাটনে? এই প্রক্রিয়ায় হয়তো বাঁধনমুক্তি ঘটবে নির্মাণ কর্মের। অথচ এই অনুশাসনের কোনো দিক-নির্ণয় এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কোনো অর্থবহতা, তাও নয়। যেন প্রতিদিনের অবস্থানের পারম্পর্যে গড়ে ওঠা এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এবং অবশেষে সেই শূন্যতার কাছে ফিরে যাওয়া। তাই নিস্তার পাবার জন্য প্রয়োজন উচ্চারিত শব্দগুলিকে নিষ্পেষিত করে শব্দহীন করে তোলা, এ সেই শব্দহীনতা যার অবস্থান সমস্ত শব্দের সম্পৃক্ততায়—যা কিছু বলার, বক্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নতুন আকার পাওয়ার জন্য আকারহীনতার প্ররোচনা দিচ্ছে শূন্যতার পরিব্যপ্তি।

'কী এসে যায় কে বলেছে, কেউ একজন বলেছিল', নিস্পৃহতায় উচ্চারণ করেছেন বেকেট। তাঁর অবস্থান ছিল অন্যতর, আত্ম-উন্মেষ ও বহির্বিশ্বের হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করতে বোদেলের উচ্চারিত বাক্যগুলিতে শয়তানের উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিঘাত খুঁজে পাননি তিনি।

আমাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে আমরা কি সচেষ্ট হব প্রকাশের কল্পনা থেকে লেখাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে, শুধুমাত্র তাকে নির্দিষ্ট করতে? অথচ সেই অবস্থানটির কোনো অন্তর-আত্মা নেই। দৃশ্য ও বাস্তবকে উন্মোচন করার জন্যই যদি ভাষার ব্যবহার, অর্থ অনুধাবনের ব্যাপারটি তখন উপেক্ষিত, কেননা, ভাবনা ও চিন্তা প্রকাশকে ভিন্নতর কোনো মাত্রা আরোপ করতে আগ্রহী নয় ভাষা। অথছ বহির্বিশ্ব উন্মোচনেই ভাষার ব্যবহারের সার্থকতা। এ এক হঠকারি খেলা, খেলতে খেলতে পাল্টে যাচ্ছে খেলার নিয়ম আর অবলীলায় লঙঘন করা হচ্ছে নিয়মের সীমানা। উৎকর্ষের জন্য নয়, ভাষার ওপরে কর্তৃত্ব স্থাপন নয়, শুধু এক চমৎকারি নির্মাণকৌশলে ভাষাকে নিশ্চিতভাবে বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

যাও, শুষ্ক বৃক্ষমূলকে বলতে ইচ্ছা করে, ঈশ্বর-সন্ধানে তোমার প্রাণহীনতা। তখন সংশয় ঘন হয়। বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে যে ব্যবহার, তার ব্যাপ্তি সর্বব্যাপ্ত নয়, সামুরাইগণ অবশেষে ব্যস্ত হন প্রভুর পরিচর্যায়।

সার্ত্রের existentialism—এর ব্যাপারগুলি অনেক আগেই অসার্থক প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রমাণ হয়েছে অসীমকে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা কূপমন্ডুকতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

যা কিছু সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রচেষ্টা, আসলে শেষ পর্যন্ত সে সব কিছুই সমাজ ও সভ্যতার এক সমীকরণশীলতার প্রয়োজনে অন্যতর শ্লীলতার সম্মুখীন হওয়া। বোধের মধ্যে সাবলীলতা ও শাসন—এই অনুশাসনে ভাষা হয়ে উঠেছে সরল রেখায় একমাত্রা সম্পর্ক স্থাপনের সূত্র—সাহিত্য রচনার পরম্পরায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই সম্পর্কের। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম, ভালবাসা, বিদ্বেষ, অনুশোচনা, এসব প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে একটি নিটোল সমাজ-সভ্যতা পরিপূরক ব্যবহারের আধারে।

মহত্ত্ব, যা সভ্যতারই প্রকাশমাত্র, অনুশাসন করেছে সাহিত্যকে। যার কারণে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল discourse—এর একটি পন্থা, আর তারই অনুষঙ্গে ভাষার সম্পৃক্ততা। ব্যবহৃত হয়ে ওঠার যে ব্যাপারটি সেটিই হয়ে উঠেছে দায়বদ্ধতা। আর বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেদ্বন্দ্বন্দ্ব humanism আর ভাষার শুদ্ধ স্থাপনের ব্যাপারটি, এসবই শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হওয়াই মানবিক প্রয়াস অথবা মানবিকতা, শেষ পর্যন্ত সাহিত্য হয়ে উঠেছে ভাষা-রহিত, অথবা ভাষাকে বীর্যহীন করে তোলার প্রক্রিয়াই হয়ে উঠেছে সাহিত্য। এমনকি মালার্মের অবস্থানটিও সেই ষড়যন্ত্রীদের অবস্থান থেকে দূরে নয়।

আসলে ভাষার সঙ্গে সংঘাতেই সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই সংঘাত চির বিদ্যমান, যে ছিল প্রতিপক্ষ সময়ের বিবর্তনে তার প্রকাশগত ভিন্নতা ছাড়া আর কোনো অমিল নেই। ভাষা, যে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ও ভারহীন এবং অবস্থানগতভাবে অনন্ত, তার সঙ্গে সংঘাত সাহিত্যের অবক্ষয়। এই দোষে গ্যেটে, দান্তে, শেক্সপিয়ার, থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সবাই কি দোষী?

একমাত্র যে মানুষটি ধীতস্ত ছিলেন এবং সংঘাতগুলিকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি কি নিৎসে? তিনিই বুঝিয়েছেন ভাষার সম্পূর্ণ উপযুক্ত একটি মাত্রা আবিষ্কারে সাহিত্যিকেরা সক্ষম হয়ে ওঠেননি। ভবিষ্যদ্‌বক্তার মতো তিনি জানিয়েছেন মানুষ সৃষ্ট সাহিত্য ও মানুষের মূল্যহীনতার কথা। জার্মান ক্লাসিজিম ভাবনায় সময়কালের বিচারে 'প্রকাশ' সাম্প্রতিক হয়ে উঠলেও, জার্মান সাহিত্য তার পরিকাঠামো ও প্রকাশের সঙ্গে ইন্টারপ্রিটেশন অথবা ব্যাখ্যার সমন্বয় ঘটাতে পারেনি। সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারে প্রকাশের সঙ্গে ব্যাখ্যার যে সংঘাতের রূপ তাকে স্মরণ করেই নিৎসের এই উক্তি। ভাষা প্রয়োগে বেকেট যে নিস্পৃহতার কথা বলেছেন, এই সংঘাতকে পরিহারের উপর হিসাবে নিস্পৃহতাকে তিনি সাহিত্যের মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। বিষয়-ভিত্তিক বর্ণনা থেকে মুক্ত করে সাহিত্যকে নির্দেশিত করা হয়েছে ত্রম-উন্মোচনে। এই উন্মোচনে বহির্জগতে যে প্রকাশ সেই প্রকাশে সাহিত্য লঙঘন করবে ভাষা সৃষ্টির সাবেকী উপায়গুলি ও তার সীমানা, তখন সৃষ্টি হবে অন্যতর স্পেশ যেখানে হারিয়ে যাবে লিখিত বিষয় ও ভূমিকা—এই ছিল বেকেট-এর আকাঙক্ষা।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে রোমান্টিকরা যে প্রকৃতি ও বহির্জগতের সন্ধান করেছেন, বেকেটের বহির্জগতটি তার থেকে কতখানি ভিন্ন। অধিকতর জরি যে ব্যাপারটি, সভ্যতার বিকাশ ও সমাজ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আমরা জীবন-মৃত্যু, ভালো-খারাপ, ঈশ্বর-শয়তান, সুখ-অসুখ, ন্যায়-অন্যায়, ইত্যাকার একমাত্রিক প্রকরণগুলিকে আমাদের অভিজ্ঞতায় কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থাপন করেছি। সময়ের উত্তরণে গুণাগুণের প্রকারভেদ হয়েছে কিন্তু একমাত্রিক বিভাজনটি কখনোই পরিত্যক্ত হয়নি। বহু সহস্রাব্দীতে গড়ে ওঠা যে লৌহবর্ম পরিধানে আমাদের কৃষ্টি, এই নতুনতর অভিজ্ঞতা কতখানি ভাঙতে পারে সেই লৌহবর্ম? আমরা এখনও মানুষকে প্রতিরোধহীন আর প্রকৃতিকে মানবধর্ম আরোপ করে আমাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিচ্ছি।

ব্যাপারটি অনুধাবনে ও তার অসত্যতাকে কিছুটা অন্তত সত্যবদ্ধ করার তাগিদেই বক্তাকে অপসৃত করে মালার্মে সূচনা করেছিলেন নতুন বিপ্লবের। অরট্রুড্র (দাদা-আন্দোলন) এই আন্দোলনকে গভীর ও প্রত্যয়ময় করে তুলেছিলেন বর্ণনার ভাষাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে 'শরীর ও চিৎকার'-এর নৃশংসয়তাকেই প্রকাশের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে।

ইতিহাসের পরম্পরায় সাহিত্যের ভাষার মূল পরিচয়টি হয়ে উঠেছে একটি লঙঘনকারী শক্তি, যা কেবলই ঘোরাফেরা করছে 'অশুদ্ধ ভাষণ', 'শুদ্ধ নিঃশব্দতা'য় আর তৈরি হচ্ছে এদুটি অবস্থানের বৈরিতা। ভাষা ও বলা-কথার যে স্পেশগুলি, সেগুলি যেন আবদ্ধ থাকছে অশুদ্ধতার বাতাবরণে, আর শুধুমাত্র নীরবতা ভঙ্গের জন্যই কথা বলা। গ্রিক সাহিত্যের সময় থেকেই এই বৈরিতার শু যে কারণে মৃত্যুর বর্ণনায় অর্কিয় মাত্রায় মৃত্যুকে জয় করা নয়। অন্যতর গুণাবলী আরোপে তাকে মহিমান্বিত করা। এই বৈরিতার পরম্পরাটি আজও বিদ্যমান। অবশ্য এই ট্রানস্‌গ্রেশন কাঠামোর যে কোনো পরিবর্তন হয়নি তা নয়, অন্যতর সাহিত্য প্রক্রিয়ায় ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে একটি প্রতিমূর্তি অথবা সাদৃশ্য হিসাবে, বর্ণনার একটি প্রতিরূপ ভাষ্য হিসাবে, যদিও বর্ণনা নিজেই সেই সাদৃশ্য কেননা তার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। অথবা বলা চলে, তাকে নিয়ে যে ভাষ্য রচনা তার মধ্যেই তার বাস। এর ফলে যা ঘটতে থাকে, সেই ভাষ্যে অসংখ্য কণ্ঠের সমাহার। সেই নানা কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্যগুলি কেমন যেন অপরিবাহী কৃত্রিম আবরণে বিযুক্ত হয়ে যায়, এবং অদৃশ্য কোনো শক্তির চালনায় 'জড়-পদার্থ, বাক্যগুলি চলমান হয়ে উঠে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা। তখন ভাষা নিজেকেই আবার নতুন করে গঠন করে নেয়, আর পূর্বে বলা কথাকে প্রক্ষিপ্ত করে নতুন বর্ণনার ঘূর্ণাবর্তে। যা হওয়ার তাই ঘটে তখন—বলা কথাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার ধ্বনিত হয় নানা কণ্ঠে তারা একে অন্যকে প্রশ্রয় দেয়, পাল্টে দেয় আর ধ্বংস করে—এভাবেই লেখা ও লেখক উভয়কেই

ছুঁড়ে ফেলছে সেই সাদৃশ্যের দূরত্বে যেখানে নিজেকেই নিজে হারিয়ে ফেলছে ভাষা, আর কেমন যেন বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বাস করে সেই দুস্তর প্রতিমূর্তি গৃহে।

যা প্রয়োজন, আমাদের চেতনা ও বোধে শব্দ ও ভাষার যে অসম্পূর্ণতা, তাকে পরিত্যাগ করে আমাদের ভাবনাকে করে তুলতে হবে এক আধিভৌতিক শক্তি ও আমাদের শরীর-মজ্জার যন্ত্রণা, যা একত্রে উত্থাপন করবে বিষয়কে, অথবা স্বয়ম্ভু হয়ে চিন্তা অবতীর্ণ হবে বিষয়ের ভূমিকায়। যে বলছে তার নিশ্চিহ্নতাতেই ভাষার হয়ে ওঠা, এবং যখন আধিভৌতিক শক্তি ও শরীর যন্ত্রণা উদ্ভূত উপাদানে তৈরি হবে প্রকাশের ভাষা তখনই সে লঙ্ঘন করতে পারবে তার সীমাবদ্ধতা।

মিথের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ, শব্দ সচেতনা, প্রকাশের প্রত্যয় আর কথপোকথনের বাতাবরন—এই অভিজ্ঞতায় গড়ে উঠেছে সাহিত্য। সাহিত্যের স্বাধীনতা এই মিথ প্রভাব থেকে মুক্তিতেই। এলিয়েট বলেছিলেন ভাষা কর্তৃত্ব করবে স্থান ও কালের ওপর আর সূচনা করবে ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রতিজ্ঞা যে প্রতিজ্ঞায় স্মৃতি ও বর্ণনা প্রকাশ পাবে সত্যের শাশ্বত ও প্রত্যক্ষরূপে। বলা বাহুল্য, মিথ-নির্ভর প্রজ্ঞায় উচ্চারিত এই বাণী সারশূন্য। কেননা এই কর্তৃত্বের কারণেই ভাষার প্রয়োগ মানুষের গড়ে ওঠা সংস্কার-এর অঙ্গুলি সংকেতেই মাত্র। আর তাই এই আচরণে ভাষা সীমাবদ্ধই থেকে যায়—তার যা কিছু শক্তি শেষপর্যন্ত তা নিয়োজিত করা হয় অনুভূতিকে গোপন করতে। এ কারণেই সর্বস্বান্ত হয়ে ভাষা অপেক্ষা করে নির্জন গহ্বরে। তবুও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় বদলে যায় সেই অপেক্ষার অবস্থান, আর সে কেবলই গড়ে তুলতে চায় একটি আন্দোলন যা কখনোই অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

অথচ এই আন্দোলন স্পৃহা ও তার জন্য অপেক্ষা থেকে নিষ্কৃতি নেই সাহিত্যের, কেননা এটিই সাহিত্যের চিরকালীন সন্ধান। এই অনুসন্ধানে মনে রাখতে হবে, আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশ ও দীর্ঘ অবস্থানে আমরা শব্দ ও বাক্যকে ব্যবহার করেছি তার্কিক বিচারের ভাষায়, বলা ও শোনানোর তাগিদে। সেই পরম্পরায় আমাদের জীবনধারণের প্রক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবহারের সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা ভাষা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আশ্রয় নিয়েছি শুধুমাত্র নৃবিদ্যা ও প্রাদেশিক/প্রাকৃত বাচন অধ্যয়নে। এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ের একটি প্ররোচনা দিয়েছিলেন কান্ট তার nihil negative Ý nihil privativum-এর প্ররোচনায়। কিন্তু তিনি নিজেও আশ্রয় নিয়েছিলেন 'আলোচনা' ও 'মানসিক চিন্তা' এ দুটি অনুষঙ্গে, যা বিচার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

আলোচনা ও বিচারেই সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা, আর সেই সূচনায় অবশ্যম্ভাবীভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে মৃত্যু। সেই প্রচেষ্টা—'মৃত্যুকে এড়াতেই সাহিত্য সৃষ্টি, একটি অমরতার লক্ষ্য। একটি তীর যা বিদ্ধ করতে পারে সময়ের একটি অবকাশকে, সেই অবশ্যম্ভাবিকতাকে স্থগিত রাখার জন্য তাকে বন্দনা, হোমার যেমন বলেছিলেন ঈশ্বর মানুষকে উপহার দিয়েছেন দুঃখ ও যন্ত্রণা, কেননা তারা তখন সে সব জানাতে পারবে অন্য সবায়কে। এই যে মৃত্যুর শাশ্বতার ধ্রুব সত্য, তার কারণ মূল্যহীন হয়ে ওঠে বর্তমানের অবস্থান। শূন্যতায় শাশ্বতের যে অবস্থান সেই অবস্থান থেকেই আমাদের কথা বলা। 'প্রশংসিত হোক যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে বীরেরা, তাদের অমরত্বের জন্য জয়গাথা লিখবেন কবিরা', এই অবস্থান থেকেই সাহিত্যে ভাষা সৃষ্টির শু, যে অবস্থানটি মূল হয়ে আছে ভাষা অনুধাবন প্রক্রিয়ায়। অসীম উত্তরণের প্রয়োজনে প্রতিটি ভাষাতেই যা জরি হয়ে ওঠে তা যেন মৃত্যুর কালো দেওয়ালের সামনে একটি আয়না প্রতিস্থাপন। এই সেই আয়না যার গভীরতা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবার তারই ভেতরে বারে বারেই ফিরে আসতে হয়েছে ইউলিসিসকে, সেই আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত।

এই প্রতি-উত্তরণ সেই মোহটি, মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করার চিন্তা, যেন অসীমের শূন্যতাকে পরাজিত করে অসীমকে পাওয়া। অথচ মিথ-নির্ভর কোনো সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেনি, মৃত্যুর চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং রক্ত-মাংসের শরীরে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হতে। তখনই একমাত্র শেষ হওয়া সম্ভব শূন্যতার সীমাবদ্ধতা আর সফল হয়ে উঠবে ভাষা সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

আমাদের অনুসন্ধান সেই অবলম্বন যা আমাদেরকে আশ্রয় দেবে আমাদের সম্পূর্ণতায়, আর সেই লক্ষ্যে কথা বলায় তৈরি হবে ভাষা, ঠিক যেন কাফকার পশুটির মতো, মাটির নীচে তার তৈরি গহ্বরের তলদেশ থেকে অবশ্যম্ভাবী আর ক্রমবর্ধমান গর্জন হয়ে ওঠে ভাষা। ভবিষ্যতের উপলব্ধিকে বিস্তৃত করার প্রয়োজনেই ভাষার ব্যবহার, অথচ এর সত্যিকারের উপাদানটি এখনও সম্পর্ণ পরিচিত হয়ে ওঠেনি আমাদের কাছে। ভাষা তার বর্তমান অবস্থানে কেমন প্রাণহীন হয়ে আছে দুটি সরল প্রকরণে—প্রথমটি বলা কথার পুনরাবৃত্তি, দ্বিতীয়টি সেই সীমাবদ্ধতায় যা কিছু উচ্চারণ তারই ব্যবহার মাত্র। তবুও অতীতের সাহিত্য থেকেই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে সীমাবদ্ধতা থেকে নিষ্কৃতির উপায়, কেননা জ্ঞানের বীজটি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাতেই আহরণ সম্ভব। সেই আহরণে যে নতুন নান্দনিকতার জন্ম তা গড়ে উঠবে স্মৃতি ও ইতিহাসের পরিকাঠামো আর বহির্বিশ্বের বস্তু ও জীবনের অধিবিদ্যামূলক ধ্যান থেকে, গড়ে উঠবে নতুন একটি বোধ ও পাণ্ডিত্য যা তৈরি করতে সক্ষম হবে স্বাধীন ও মুক্ত কল্পনার অবকাশ। জ্ঞানের নির্ভুল প্রদক্ষিণে যে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেটি প্রহরী হয়ে থাকবে ভাষার।

অস্বীকার করার উপায় নেই মানুষের সৃষ্টি ভাষা অন্যতর এক সন্দেহের উদ্রেক করে। মানুষের ভাষা শুধুমাত্র উচ্চারিত বাক্যের প্রকাশকেই প্রদক্ষিণ করে। মানুষ ব্যতীত অন্য সব প্রাণী ও বস্তুও কথা বলে। সত্যিই তো সম্ভব, বৃক্ষপত্র, সমুদ্র, পশু ও পাখিরা, মানুষের তৈরি মুখোশ এসবই কথা বলে, কিন্তু তাদের ভাষা নিজেকে এমন করে গড়ে নিয়েছে যা মানুষের ভাষায় কথা -বলার মতো নয়। মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য কি কখনও নির্দেশ দিতে পারবে সেই ভাষার?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com